ইলার দ্বিতীয় গর্ভ

দেবেশ রায়

রাতে তার বাড়ি ফিরতে-ফিরতে যদি ভবার ঘুমিয়ে না-পড়ার সম্ভাবনা থাকে, তা হলে সে দরজার বেলটা দু'বার বাজায়, পরেরটা একটু ছোট করে, যেন ডাকে, 'ভবা-আ'।

তাতে, যদি ভবা সত্যি ঘুমিয়ে পড়ে থাকে, তা হলে ভবা জেগে ওঠে না।

কিন্তু মাঝে-মাঝে এমন দুর্যোগও ঘটে যে ভবা প্রায়-ঘুম থেকে তড়াক করে জেগে উঠে মশারি ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে 'বাবা বাবা' বলে আর ইলার আগে ভবাই দরজা খুলে দেয়। ওপরের ছিটকিনি সে হাতে পায় না। সোফার হ্যান্ডেলের ওপর দাঁড়িয়ে পেয়ে যায়। মাঝের তিন-চারটি তো তার হাতের মুঠোয়। ইলা বলে ওঠে, 'হল তো! এখন রাতভর যুদ্ধ চলবে। মনে রাখিস তোকে সকাল ছ'টাতেই উঠতে হবে আর তোর বাবা টেনে দশটা পর্যন্ত ঘুমোবে।'

ইলার কথাগুলো একটু বেশি রকম সত্যি। ভবার স্কুলের বাস আসে সকাল ছ'টায়। সে ফিরতে-ফিরতে বেলা তিনটে। আর, যত আলসেমি করেই বেরক শিতিকে বারটা-একটার মধ্যে বেরতেই হয়। ফোনাফুনি করে যতই সময়টা একটু পেছুতে চাক। তার তো রাতে ফেরার কোনো সময় নেই। রাত দুটোতে পেজ ছাড়া হলে বেরয়। তারপর তো আর-কোনো খবর লেট সিটিতে যাবে না। বেশির ভাগ সেই নিশুতিতে দরজায় সে একটা ছোট অভিমানী টুং করে। তা হলে সত্যি-সত্যি তো ঘুমন্ত ছাড়া ভবাকে সে দেখতেই পায় না।

কিন্তু যদি কখনো কোনো রাতে দশটা-এগারটার মধ্যে ফিরে আসে, তা হলে বাড়িতে বাপ-মেয়ের উৎসব লেগে যায়। রোজই তেমন একটা উৎসবের আশা নিয়ে বা আশার শেষে,

ভবা ঘুমোতে যায়। তবে, এখন আকস্মিক উৎসবের রাতের নিয়মটাও ঠিক হয়ে গেছে— ভবার সকাল ছ'টার কথা ভেবে। একটু প্রাথমিক 'বাবা', 'বাবা', 'ভবা ভবা' হওয়ার পর শিতি খুব তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকে হাত-পা ধুয়ে লুঙি পরে বেরিয়ে এসে ভবাকে বুকে করে খেতে বসে যায়। ভবা তখন বাবার বুক থেকে নেমে গিয়ে পাউডারের কৌটোটা নিয়ে আসে ও শিতির বুকেপিঠে পাউডার ছড়িয়ে দেয়, হাত দিয়ে সারা শরীরে লেপে দেয়। যেমন ইলা ভবাকে মাখায়। ইলা বলে, 'দেখিস আবার মাছের ঝোলে পাউডার ঢালিস না।'

কোনো রকমে খাওয়া শেষ করে, শিতি, ভবাকে নিয়ে মশারির মধ্যে ঢুকে যায়। ভবা শিতির বুকের ওপরই কথা বলতে-বলতে বা শুনতে-শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে। অনেক এমন দিনে, টুকটাক কাজ সেরে যখন ইলা আসে শুতে, দু-জনকে এমন গভীর ঘুমে দেখে তার মায়া হয়— শিতির বুক থেকে ভবাকে নামাতে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখে। তারপর ভবাকে তার জায়গায় সরিয়ে নিজে মাঝখানে শোয়। ঘুমের ঘোরে ভবারও মায়ের গন্ধ দরকার হয়, শিতিরও ইলার গন্ধ দরকার হয়, ইলারও দু'জনের গন্ধই দরকার হয়। ইলার ঘুম আসতে একটু দেরিই হয়, কারণ বেশির ভাগ রাতেই তো শুতে-শুতেই শেষ রাত।

ইলা নিজের বাড়িঘরের লোকজন বা নিকট বন্ধুদের মধ্যে রসিকতা করে, 'আমাদের তো বিয়ে হয়েছিল শেষ রাতের লগ্নে। ব্রাহ্ম মুহূর্তের আগে, শুকতারা ওঠার ঠিক আগে। শুকতারা উঠলে তো লগ্ন পেরিয়ে যাবে। তাই আমাদের শেষ রাত ছাড়া শুভদৃষ্টি হয় না কোনো দিনই।'

আজকের ব্যাপারটা একটু বেশি রকম আলাদা। রাত ন'টায় শিতির বাড়ি-ফেরা সত্যি করেই অঘটন।

ইলা ব্যস্ত হয়ে ওঠে, 'শরীর খারাপ না কী?'

শিতি একগাল হেসে প্রথমে তার গলায় ঝুলে থাকা ভবাকে বলে, 'দাঁড়া, এগুলো নামাই—' অর্থাৎ তার কাঁধে ঝোলানো ল্যাপটপের ব্যাগ আর তার পিঠে ঝোলানো ব্যাগটা—যেটা সবারই পিঠে ঝোলে, হলুদ আর বেগনির বর্ডার দেয়া।

ভবাই বাবার ব্যাগগুলো বাবার গলা-ঘাড় থেকে খুলে শোফার কোণে রাখে। শিতির অভ্যেস শার্ট গুঁজে পরা। সে শার্টটা খুলতে-খুলতে শার্টের ভেতর থেকে বলে, 'বাড়ি ফিরলে শরীর খারাপ? তা হলে তো বাড়ি না ফেরাই ভাল। অফিসের কাজেও তো বাড়ি ফেরা যায়। না? আজ বাড়িতে বসে নাইট করব।'

গেঞ্জিটা যখন খুলছিল শিতি তখন তার মাথা থেকে গেঞ্জিটা টেনে বের করার অছিলায় ইলা একবার শিতির গায়ের তাপ নিয়ে নেয়— না, ঠান্ডাই তো, তা হলে জ্বরটর আসে নি।

ইলা এবার হেসে শুধোতে পারে, 'তাই? তা হলে তো রোজই করলে পারো।'

বাথরুমের দিকে যেতে-যেতে শিতি বলে, 'রোজ কি আর বাড়িতে অফিস বসানো যায়? তখন তো বলবে বাড়িটাকেই অফিস করলে। কিন্তু জানো, আজকাল কর্পোরেটে সেই লাইনেই চলছে। বাড়ি থেকেই যদি অফিস করানো যায়, তা হলে অফিস-স্পেসের ভাড়া বাঁচে।'

এমন সব কথাবার্তায় ভবা ভয় পেয়ে বলে, 'বাবা কি এখন স্নান করে অফিসে যাবে?' বাবা কখন স্নান করে অফিসে যায় তা তো আর ভবা দেখে না। অফিস থেকে বাপকে তো সে ফিরতেই দেখে। দুই কামরার ফ্ল্যাটে একটাই বাথরুম। সমকৌণিক আর-একটা ঘরের সঙ্গে। সেখানে আবার দেয়ালে ছোট একটা তাকে ভবার সংসার। তার ছেলেমেয়ে, খেলনাপাতি, ছবি আঁকার খাতা, রঙের বাক্স, তুলি, আরো কত কী। এই জায়গাটা ইলা ইচ্ছে করেই বেছে দিয়েছে। রান্নাঘরে কাজ করতে-করতেও নজরে রাখা যায়। তা ছাড়া, রান্নাঘর থেকে তো অনবরতই বেরতে হয়। ইলা একবার বলেছিল— রান্নাঘরের সঙ্গে এই জায়গাটার মাঝের দেয়ালটা ভেঙে দেবে। শিতির আর আপত্তি কী। কিন্তু এ তো একটা আবাসন। কর্তারা আপত্তি করলেন। ওটা না কী লোড বিয়ারিং ওয়াল। ঐ ওয়ালের মাথায় না কী লোহার বিম আছে। ঐ দেয়ালটা সেই বিমের ভার বইছে। ঐ দেয়াল ভাঙা যাবে না। তবে, মাঝখানে খানিকটা বড় ফাঁক করে নেয়া যেতে পারে।

যখন এই আবাসন তৈরি হয়েছিল তখন কিচেনেট বলে একটা জায়গার কথা চালু হয় নি। রান্নাঘর তো ভাঁড়ার ঘরও বটে। তাতে কত কৌটো-শিশি-বোতল থাকে। সেগুলো এক মাপের করে তাক বানিয়ে রাখলে তো সুন্দরই লাগে। গ্যাস ও ওভেন ঘরে-ঘরে আসার পর বাসস্থানের ধারণা বদলে গেছে। এখন পুরো বাড়িটাই সাজানো-গোছানো বসার জায়গা। ইলা এত কিছু ভাবে নি। তার এইটুকু ফ্ল্যাটেও মনে হত, মনে হয়, ভবা কখন চোখের আড়ালে পড়ে গেল। খুটখাট যে-সব শব্দ করে ভবা খেলছিল সেটা বদলে গেলেই তার বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে। দৌড়ে এসে একবার দেখে যায়—ভবা কী করছে। ভবা একেবারেই দুষ্টু নয়। কিন্তু কোনো সময় স্থির থাকে না। বাড়িময় যে দাপিয়ে বেড়ায়— একেবারেই তা নয়। তার জায়গাটুকুতেই তার ব্যস্ততার শেষ নেই। এই তার কোনো পুতুলের চুল আঁচড়ে দেয়। তেমন আঁচড়ানোর নানা রকম চিরুনি আছে, তাদের চুল বাঁধবার নানা রবার ব্যান্ড আছে। ইলার সঙ্গে যখন দোকানপাটে যায়, তখন তারও একটা ঝুড়ি থাকে। আজকাল সব বাচ্চারই কি এমন অভ্যাস। নইলে দোকানগুলিতে মায়েরা যে-সব জিনিশ কেনে তার এমন বেবি-সংস্করণ থাকে কী করে? বেশির ভাগ দোকানেই এগুলো ফ্রি। খদ্দের ধরে রাখার ফিকির। ভবা যে তার সংসার নিয়ে এত ব্যতিব্যস্ত খেলে তা কি ইলারই দেখাদেখি। কিন্তু তা তো নয়। তা হলে তো ইলা সাজত। ভবা একেবারেই তেমন না। হয়তো পুতুলদের চুল বেঁধে দেয় ঠিকই। কিন্তু তারপরই আর আওয়াজটা পাওয়া যায় না। চুলবাঁধার সময় একটু গুনগুনিয়ে কথা শোনা যাচ্ছিল। সেই কথাটা আর শোনা না গেলেই ইলা ছুটে এসে দেখে ভবা নাচছে। ওর একটা নাচের ক্লাশ আছে। সেখানে কিছু হাত-পা নাড়ে কিন্তু এই আবাসনে যখন নববর্ষ, রবীন্দ্রজয়ন্তী, বসন্তোৎসব হয় তখন বাচ্চাদের নাচ দেখে একবার শিতি বেশ সলজ্জ বলেছিল— 'ভবা যখন হাত তোলে তখন কেমন সোজা তোলে দেখেছ?' ইলা হেসে বলেছিল— 'সব বাবারাই তাদের মেয়ের হাত সোজা দেখে।' কিন্তু পরে লক্ষ করে দেখেছে কথাটা সত্যি। ঐ দলের মধ্যে ভবা যখন চিবুক তোলে তখন তার চুল থেকে চিবুক একটা লাইন হয়ে যায়। অন্য বাচ্চারাও কি ভবার মত তার পুতুলদের নাচ দেখায়? নাকি ও-ও তখন পুতুল হয়েই নাচে? একবার ভেবেচিন্তে এক জোড়া ছোট ঝুমুর কিনে নিয়ে এসেছিল ইলা। 'যখন নাচবি তখন এটা পরে নিবি, আমি শুনতে পাব ভবা নাচছে।' ভবাও খুব খুশি। পা থেকে ঝুমুর আর খোলেই না। তার ওপর নাচের স্কুলের সুবাদে সে ঝুমুরের তালও বদলাতে পারে। সারাটা বাড়ি ঝুমুরের নানারকম আওয়াজে মুখর থাকে। ইলা নিশ্চিন্ত হয়। তার বুক আর ধড়াস করে ওঠে না। ঝুমুরের আওয়াজ তাকে ঘিরে রাখে। ঘুমের মধ্যেও ভবা ঝুমুর খুলত না। শিতি আর ইলা নিজেদের নিয়ে হাসাহাসি করত— 'ভবা তো আমাদের ঘুম নাচিয়ে দিল।' ভবাকে বসিয়ে, কখনো-সখনো, ভবা ঘাগরা পরে শুধু পা ফেলে-ফেলে ঝুমুরের কত তালফেরতা করত। ও জানে না, তাকে তাল-ফেরতা বলে। কিন্তু ঝুমুরের আওয়াজ তার শিশু কানের অপাপবিদ্ধ সরলতায় জলকল্লোলের মত স্বাভাবিক ধ্বনির জটিলতাকে পথ করে দিত।

ইলা বলত, 'ভাগ্যিস, বুদ্ধিটা মাথায় এসেছিল। নইলে

আমার বুকের অসুখ হয়ে যেত।'

শিতি বলত, 'তোমার এমনিতেই ধরত। একটা আটশো ফুটের ফ্ল্যাটে একটা মাত্র দরজা, তার ওপর কোল্যাপসিব্‌ল্‌। এখান থেকে কি ভবা কর্পূরের মত উপে যাবে নাকী!'

'সবই তো বুঝি কিন্তু মন তো বোঝে না। আসলে এটা এক-বাচ্চার মায়েদের অসুখ। অনেকের কাছেই শুনেছি।'

'দুই বাচ্চা হতে তো অসুবিধে ছিল না।'

'এ তোমাদের বোঝানো যাবে না। দশ মাস ধরে তো আমারই ভেতরে ছিল। জন্মের পর তো আমারই বুকের দুধ খেয়েছে। মেয়েদের যে কী অনিশ্চয়তা। পারব তো? পারব তো? ওর জন্মের পর, ও বুকের দুধ ছাড়ার পরও কখনো মনে হত না, পেরেছি। এখন যখন স্কুলটুল যাচ্ছে তখন আর নিজেকে নিয়ে ভাবি না, কিন্তু ভয়টা থেকেই গেছে। তখন আর-একটা বাচ্চার কথা ভাবনার ত্রিসীমানাতেও আসে না। আর এখন তো ভবার জন্যই সম্ভবও নয়, দরকারও নেই।'

তারপর নিজেকেই বকে উঠেছিল, 'ছিঃ, কী অমঙ্গুলে কথা বলে ফেললাম। সন্তান কি সম্ভবের কিছু, না দরকারের কিছু। ভবা তা হলে সম্ভব হয়েছিল কেন, কোন দরকারে। কিন্তু এখন যদি ওর একটা ভাই বা বোন হয়, তা হলে ও তো আমাকে নিয়েই মহাফাঁপরে পড়বে। ওর চেনা মা-টা এমন বদলে যাচ্ছে কী করে? ভবারই তো আট হল। দুটো বাচ্চা হলে যে-সুবিধে সেটা পার হয়ে গেছে।'

'না কী দুই বাচ্চার দুশ্চিন্তা ডবল হয়ে তোমার ওপর চেপেছে।'

'সত্যি আমাদের মত সংসারে যাদের দু-জনকেই চাকরি করতে হয়! উঃ বাবা! ভাবতে পারি না। প্রত্যেক অফিসে ক্রেসে রাখা উচিত। কেন এ-সব মনে আসে— আর এক বাচ্চা। ভবা ভাল থাক। তা হলেই হল। তাই না? আমার আর সন্তানের দরকার নেই। তাই-বা কেন বললাম। সন্তান কি দরকারের? একটা কোনো অন্য ব্যাপার থাকে।'

'অনেক অনিশ্চয়তা তো থাকেই। কিন্তু ডাক্তারি, ওষুধ-বিষুধ হাসপাতাল, এ-সবও তো বেড়েছে।'

'সে না-হয় বেড়েছে। তারপরও তো কত ঘটনা ঘটে। দু-তিন মাসে বাচ্চা নষ্ট হয়ে যায় না? ভরা পেটের মরা বাচ্চা হয় না?'

'ডাক্তাররা সেজন্য আজকাল আর দেরি করে না। তাড়াতাড়ি সিজার করে দেয়। মেয়েরা, বিশেষ করে শহরের মেয়েরা, শিক্ষিত মেয়েরা বাচ্চা হওয়ার ব্যথা তুলতে ভয় পায়। তারা বলে— ডাক্তারবাবু, অপারেশন করে দিন।'

'হ্যাঁ, সে ঠিকই। তারও তো কত বিপদ। বাচ্চা যখন নিজের মত করে বেরয়, সেটাই সবচে ভাল। তাও তো না। কেন যে এ-সব মনে আসে।'

ঝুমুর কবে কখন ভবার পা থেকে খুলে, তার পুতুলদের পায়ে উঠল। যে-পুতুলদের পা নেই, তাদের গলায় ঝুলল। পুতুলদের হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে ভবা ঝুমুরের আওয়াজ শুনত। তার পুতুলদের নিয়ে ভবারও যেন ইলার মতই ভয়, তারও বুক ছ্যাঁৎ করে ওঠে। কোন দিন স্কুলের ব্যাগে নিয়ে একটু বকুনিও খেয়েছে। ইলা বুঝতেই পারে না, ভবা কি তারই হঠাৎ বুক ছ্যাঁৎ করার নকল করে। সেটা কি ও বোঝে? না কী পুতুল নিয়ে, ঝুমুর নিয়ে, নতুন-নতুন খেলা বানায়?

শেষে একদিন এল— যখন ঝুমুরের আওয়াজও শোনা গেল না আর ইলার হঠাৎ বুক ধড়ফড়ও বেড়ে গেল। ইলা ভয়ই পেয়ে গেল। শেষে কি ডাক্তার-বদ্যি করতে হবে? একটাই রক্ষে, ইলা জানত, বাড়ির মধ্যে ভবার কিছু হওয়া সম্ভব নয়। সবটা তার মনের ব্যাপার। তখনই তার মাথায় এই বুদ্ধিটা এল।

রান্নাঘরের সামনে, বাথরুমের পাশের জায়গাটিতে ভবার সংসার পেতে দিয়ে বলল, 'দেখ, ভবা, আমার কত সুবিধে হবে। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে-বেরিয়ে অনবরত বেল বাজলেই দরজা খুলতে হয়। কে না কে আসে। তার বদলে কোল্যাপসিব্‌ল্‌টা টেনে দিলে তুইই তো কথা বলে নিতে পারবি।'

কোল্যাপসিব্‌ল্‌ টেনে দেয়াতে ভবার একটু আপত্তি ছিল— 'আমি তো দরজা খুলতে পারি মা, দরজা খুলে তোমাকে ডেকে দেব।'

ইলাকে একটু অভিনয় করেই বলতে হয়, 'অতবার দরজা খুলতে-খুলতে তোর আবার হাতে ব্যথা হবে। দরজা খোলাই থাকবে। কোল্যাপসিব্‌ল্‌টা টানা থাকবে। তুই বসে-বসেই, এখান থেকেই দেখতে পাবি কে এল। তোকে উঠতেই হবে না।'

ভবার অজান্তেই কোল্যাপসিব্‌লে একটা তালা ঝুলিয়ে দিয়েছিল ইলা।

তার নতুন সংসারে ব্যস্ত হয়ে পড়ে ভবা হঠাৎ কেন উঠে এসে জিজ্ঞেস করে, 'মা, বাবাকেও কি কোল্যাপসিব্‌ল্‌ দিয়ে দেখব?'

ইলা চট করে বুঝতে পারে না— ভবার মাথায় কী করে প্রশ্নটা এল ও কেন এল। ভবার ব্যাপারে এতই কম জোর তার মনের যে ভবার নিরীহ প্রশ্নেরও জবাব খুঁজে পায় না। ভবা কি ভাবল— কোল্যাপসিব্‌ল্‌ টেনে দেয়া মানে তার বাবাকে বাইরে রেখে দেয়া? সে তার পেটের কাছ থেকে ভবার তোলা মুখটা দেখে বুঝতে চাইল— ভবার মুখ জুড়ে কি বাবাকে হারানোর ভয়? নিজের আট-বছরের মেয়ের প্রশ্ন যদি এমন অনিশ্চিত করে দেয় ইলাকে, তা হলে সে বাঁচবে কী করে। আর, মেয়ের কাছে এত অভিনয় সে করবেই-বা কী করে?

'দূর বোকা! বাবা যখন ফেরেন তখন তো কত রাত। অত রাতে কি দরজা খোলা রাখা যায়? তুই তো তখন ঘুমিয়ে কাদা।'

শুনে ভবা বুঝতে একটু সময় নিল। তার পর ওর রোগা মুখে একটা হাসি ছড়িয়ে পড়ল। তারও পর সে বলল, 'আমি ভাবছিলাম, বাবা যদি একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরত আর আমি যদি একটু দেরি করে ঘুমোতাম, তা হলে, বাবা এলে কোল্যাপসিব্‌ল্‌ দিয়েই দেখে নিতে পারতাম। বাবাকে আর বেল টিপতে হত না।'

ভবার ভাবনার জগৎটার কোনো হিশেব পায় না ইলা। তার মেয়ের নাম তো ভবা হওয়ার কথাই না। শিতি তো সব রকম নামের ওপর রাগ করেই, তার মেয়েকে 'ভবা' বলে ডাকতে শুরু করে। বাবার ভবা। আর, এই আট-বছরের সেই নামটাই সবার মুখে সবচেয়ে বেশি চলে। কী এক অবুঝ জেদ ছিল ইলার— 'দেখো, তোমার নাম যদি শিতি না হত, তা হলে হয়তো আমি তোমাকে বিয়ে করতে রাজিই হতাম না।'

ওদের বিয়ে খানিকটা চেনাজানা আর খানিকটা সম্বন্ধ করা।

'হ্যাঁ, আর সেই নামের জন্যই তো আমার সেকেন্ডারির মার্কশিট বোর্ড অফিসে গিয়ে বদলে আনতে বাবাকে শিয়ালদা কোর্টে অ্যাফিডেবিট করতে ছোটাছুটি করতে হয়েছিল যে আমি মেয়ে না, ছেলে।'

ঘটনাটা সত্য। শিতির জন্ম হয়েছিল রামনবমীর দিন। আর, তাঁর ঠাকুমা জিদ ধরে বসে ছিলেন এমন পুণ্য দিনে যার জন্ম,

তাঁর নামেই তার নাম রাখতে হবে। শিতির ঠাকুমা তাঁর জেদ ও কর্তৃত্বের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। কিন্তু বাড়ির কেউ রাজি না— আজকালকার দিনে কারো নাম রামচন্দ্র হতে পারে? আর, শিতির ঠাকুমা মোক্ষম অস্ত্র ঝাড়লেন, 'রামচন্দ্রই রাখতে হবে তার নামে নেই। গুঁদের তো একশ-দুশ-হাজার নাম থাকে। তা থেকে কোনো নাম বের করো। দেখি, তোমরা কত পণ্ডিত।' উপায় বের করলেন শিতির কাকা। তিনি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করতেন। এ বাড়ির একমাত্র পিএইচডি। উনি একদিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাড়ি ফিরে শিতির ঠাকুমাকে বললেন, 'মা, হেমচন্দ্রের ডিকশনারি থেকে আমাদের সংস্কৃত ডিপার্টমেন্টের প্রধান, রামচন্দ্রের এই নামটি বের করে দিয়েছেন। শিতি।'

'শুধু শিতি?' মা নাকী জিজ্ঞেস করেছিলেন।

'হ্যাঁ, শিতির সঙ্গে যোগ করতে পারো যা ইচ্ছে— শিতিকণ্ঠ, শিতিভদ্র, শিতিভূষণ কিন্তু তা হলে আর তার মানে 'রাম' থাকবে না। বুঝে নাও।'

মা নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য নাকী বললেন, 'শিতি কি রামের একটা নাম?'

কাকা নাকি বলেছিলেন— 'রাম মানে কাল। শিতি মানে কাল। তাই রামকে তোমাদের পুরাণে, রামায়ণেও কোথাও কোথাও শিতি বলা হয়েছে। এখন দেখো এতে চলবে কী না।'

ঠাকুমা একটু চুপ করে থেকে নাকী বলেছিলেন, 'চলবে। ভগবানই যদি শিতি হন, আমার নাতি কেন শিতি হবে না?'

বাড়ির বিভিন্ন মহলে নানা রকম মত দেখা দিয়েছিল, 'মেয়েদের নাম মনে হবে তো', 'বেশ স্মার্ট শোনায় কিন্তু', 'ইংরেজি বানানে কেউ যদি সিটি লেখে'। কিন্তু এই সব মতের কোনো ভেটো ছিল না। বার্থ সার্টিফিকেটে ঐ নামই থাকল। আর অন্নপ্রাশনে ঠাকুরমশায়কে শিতির ঠাকুমা বলে দিলেন, 'ঐ নামেই প্রদীপ জ্বলবে।' নাম নিয়ে সারা জীবনই 'শিতি'কে থকল সইতে হয়েছে।

সে তো আর বোঝেনি, তার কিছুটা পরিচিত ইলা বলে মেয়েটি তার 'শিতি' নামটির জন্যই তার পরিচিতদের হয়ে উঠতে চাইছে। ইলা-র ইলা নাম দিয়েছিলেন তার ছোটমামা। তিনি কমিউনিষ্ট ছিলেন, নকশাল হয়েছিলেন, পুলিশের গুলিতে মারা যান। তাতেই ইলা জানে 'ইলা মিত্র'-এর নাম থেকে তার নাম। কিন্তু ইলা মিত্র ও সে ছাড়া তার জানা পৃথিবীতে তৃতীয় আর-কোনো ইলা নেই। আর 'শিতি' নাম তো অদ্বিতীয়। তা হলে তাদের বিয়ে হবে না কেন। আর, তাদের যখন মেয়ে হল, তখন তারও তো এমন একটি একতম, অতুলীয় নাম থাকা উচিত। ততদিনে এ-বাড়ি শুধু তাদের দু-জনেরই ও ভেটো সহ চোট সবটাই একা ইলার। ইলা কী করে যেন আসিফা নামটি জোগাড় করে ফেলে। এটা নাকি সৌদি আরবের খুব পবিত্র পর্বত। শিতি শুধু বলেছিল— 'পর্বত তো আমাদের দেশে কিছু কম ছিল না। এত দূরে গেলে?' ইলার উত্তরটা খুব স্পষ্ট ও সত্য ছিল— 'দূর বলে ও পবিত্র বলে। এ নামটা আর-কারো থাকার সম্ভাবনা নেই। আমাদের দেশের পবিত্রতাগুলো ভীষণ কমন।'

আশ্বস্ত হওয়ার জন্য শিতি শুধু জানতে চেয়েছিল, 'আসিফা— আ তো? মানে, ছেলে না মেয়ে এই নিয়ে কোনো ভোগান্তি হবে না তো— আমার মত? আমার 'ভবা'তেই চলবে— ভবার বাবা, বাবার ভবা।'

বাথরুম থেকে খালি গায়ে লুঙি পরে শিতি বেরিয়ে আসতেই ইলা জিজ্ঞেস করে, 'ভবা তো খাবে, তোমরা কি এক সঙ্গে বসবে?'

শিতি একটু অন্যমনস্কতায় তোয়ালেটা কাঁধে নিয়েই বেরিয়ে এসেছিল। সে সেটা বাথরুমে রেখে আসতে-আসতে একটু ব্যস্ত গলাতেই বলে, 'না, না, আমাকে তো কাজে বসতে হবে। সে জন্যেই তো ফিরেছি। জম্বুর ঐ রেপের ঘটনাটা ফলো আপ করব। অফিসে পাঠাব।'

'সেটা তো অফিসেই করতে পারতে।'

'তা হলে কি আর অফিস বাড়ি পাঠিয়ে করাত? আমাদের কাগজ তো এশিয়ার মধ্যে ফার্স্ট, আর আমাদের রাইভাল কাগজের তো সারা ভারতে আটটা এডিশন। তাদের যা রিসোর্স তাতে ঐ মেয়েটির ছবি পেয়ে যাবে। আর, আমরা যদি না পাই, তা হলে আমরা তো এশিয়ার মধ্যে সেকেন্ড হয়ে যাব', বলে শিতি হো-হো করে হেসে উঠল।

ভবাও হি-হি করে হেসে উঠল। বাড়িতে কখনো-কখনো এমন কথাবার্তা মা-বাবার হয়, যার কোনো থই পায় না ভবা। সে- সময়গুলোতে খারাপ লাগে ভবার। যেন, তাকে সবাই ভুলে গেছে। সে চেষ্টা করে কথাগুলোতে ঢুকতে। সব সময় যে পারে, তাও নয়। তখন সে বাবা-মা'র ওপর থেকে চোখটা সরিয়ে মেঝের ওপর শুয়ে সিলিঙের দিকে তাকায়। কখনো-কখনো বেশি ক্ষণ হলে, তার চোখ গড়িয়ে জলও পড়ে। শিতি বাথরুম থেকে তেমন একটা কী বলতে-বলতেই বেরিয়েছিল। তাতে ভবা ভয় পেয়েছিল— বাবা আজ তাড়াতাড়ি ফিরলেও তার সঙ্গে খেলবে না, এমনকী খাবেও না। কিন্তু বাবার হাসিটাতে তার মনে হল, ঘটনাটা বোধ হয় তেমন নয়। সে, ভবা, এক অব্বা হি-হি হেসে তার বাবাকে কোমরে জড়িয়ে ধরে যেন ফিরিয়ে আনতে চায়। ওর ছোট দুটি হাতে সে বাবার কোমরের বেড় পায় না। 'দাঁড়াও' বলে বাবাকে ছেড়ে দিয়ে ঘরের ভেতর থেকে পাউডারের কৌটোটা নিয়ে আসে। তারপর শিতিকে বলে, 'বসো বাবা, বসো-না।' শিতি মেঝের ওপর বসে পড়ে। তার কাঁধে, পিঠে, পাউডার দিয়ে সে তার ছোট হাত দুটি দিয়ে লেপে দেয়। তার পর, সামনে এসে বাবার বুকে পেটে পাউডার লেপে। ভবার যেন অভিযান চলে— তার বাবা তার খেলাই খেলবে।

শিতি মেঝের ওপর ভবাকে কোলে নিয়ে বসে পড়েছিল।

শিতিও যেন আরাম পায়। ইলাকে বলে, 'দাও-না একটু টিভিটা চালিয়ে— এন-ডি টিভি ধরো। আমি এখান থেকেই বুঝতে পারব।'

'দিচ্ছি। তা হলে ভবাকে খাইয়ে দিই।'

'তা দাও।'

ভবা বলে, 'আমি তোমার কোলে বসে খাই, বাবা?'

শিতি বলে, 'আমাকে তো ল্যাপটপ নিয়ে বসতে হবে।'

'বাঃ, তুমি টিভিও দেখবে, ল্যাপটপও করবে?'

'ল্যাপটপই করব। হোয়াটস আপও করব। মেলও দেখব।'

এন-ডি টিভি'র চ্যানেল এ-টিভিতে আসতে দেরি হয়। ইলা বলে, 'কই, আসছে না তো!'

'যে-কোনো একটা ইংরেজি চ্যানেল ধরো-না। তাতেই হবে।'

'এসে গেছে', খানিকটা লাফালাফির পর টিভি'র ছবি স্থির হয়। উন্নাও থেকে কাঠুয়ার রেপ নিয়ে কিছু ক্লিপিং দেখাচ্ছে। উন্নাও-এর এম-এল-এর ভাইকে অ্যারেস্ট করেছে। পুরনো খবর।

শিতি বলে ওঠে, 'দেখলেই তো মনে হয় লোকটা রেপিস্ট।'

'এগুলো অফিসেই দেখতে পারতে।'

হঠাৎ কাঠুয়ায় এক মন্ত্রীকে দেখাল— সে বক্তৃতা করছে। নীচে ইংরেজিতে পড়ল শিতি, 'রোজই তো কত মেয়েছেলে মারা যায়। এই মারা-যাওয়াটা নিয়ে এত হৈ হৈ কীসের?'

ভবা বলে ওঠে, ও ইংরেজি পড়তে-বলতে পারে, 'রেপ কী বাবা?'

ইলা টিভি বন্ধ করে দিয়ে ভবাকে হাত ধরে খাওয়ার টেবিলে নিতে-নিতে বলে, 'তোমার অফিসের কাজ ল্যাপটপে করো বা অফিসে করে এসো। বাড়িটাকে নরককুণ্ড বানিয়ো না।'

'আরে, আমি কী করলাম। বললাম তো তোমাকে। ওরা যদি কাল সকালে ছবি ছাপে আর আমরা না-ছাপি, তা হলে আমাদের কাগজ মার খাবে না। সেই জন্য আমার এক চেনা ফ্রিলান্স ফটোগ্রাফারকে আমরা জম্মু পাঠিয়েছি। সে গাড়ি নিয়ে গেছে। সে আমাকে মেলে বা হোয়াটস আপে ছবিটা পাঠিয়ে দেবে। আমি রাত দুটো-তিনটের আগে এলেও পাঠিয়ে দেব।'

'সেটা তো অফিসে সেরে এলেই পারতে।'

'অফিসের লাইনে হ্যাক হয়ে যেতে পারে। আর ঐ ফটোগ্রাফারের তো এক আমার সঙ্গেই কনট্যাক্ট।'

ভবা মায়ের সঙ্গে খাওয়ার টেবিলে। তার চোখের কোনাচে নজর ফেলে মাপছে মা আর বাবার এই কথাগুলো তাকে কতটাই একা করে দিচ্ছে। ইলা তার মুখে যে-ভাত ঠুসছে, তার তেরছা নজরের ফলে ঠোঁটটাও তেরছা হয়ে যাচ্ছে। আট বছরের ভবা এটুকু বুঝে ফেলে, তার ঐ কথাটা থেকেই গণ্ডগোল বেধেছে। সেই জন্য তার চোখ দিয়ে জল উপছোয় না। ভবা এও বুঝেছে, বাবা কিছু গোলমাল পাকিয়েছে। ভবার খুব দুঃখ হচ্ছিল যে, বাবার বুকের ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তে পারবে না। বাবাকে তো রাত দুটো-তিনটে পর্যন্ত কাজ করতে হবে। ইলা একটু জোর দিয়েই ভবার মুখে ভাত ঠেসছে। তাতে ভবা বোঝে, মা তাকে খাইয়েই বিছানায় নিয়ে শোবে ও তাকে রোজকার মত ঘুম পাড়াবে। ভবা বুঝে ফেলেছে— মা যা করবে, তাই না করলে বাবার বিপদ আরো বেড়ে যাবে।

মা তাকে খাওয়ানোটা শেষ করে ফেলল একটু তাড়াতাড়ি।

ওর মুখ ধুইয়ে মুছিয়ে বলল, 'শোয়ার জামাটা পরে নাও। পরে শুয়ে পড়ো। আমি যাচ্ছি।' আর শিতিকে বলল, 'তোমার ল্যাপটপ আর যন্ত্রপাতি নিয়ে ছাদে যাও। সেখানে যতক্ষণ কাজ করার করে নেমে এসো। আমি জেগে থাকব।'

'সে-ই ভাল, তুমি খেয়ে নিতে পারো। বেশিক্ষণ লাগবে না।'

তার ল্যাপটপ ও আরো দুটো ফোন নিয়ে ছাদে যাওয়ার জন্য দরজার দিকে এগুতে গিয়ে ফিরে এল শিতি ও আবার ঘরের ভেতর ঢুকল একটা কলারঅলা গেঞ্জি কাঁধে ফেলতে। এতগুলো জিনিশ নিয়ে বেরতে গিয়ে তার একটু অসুবিধে হয়। সেই অসুবিধেটুকু দেখে ভবা ঠোঁট ঢেকে হেসে ফেলতে পারে। বাবার দিকে তাকিয়ে। একটু যেন হালকা হয় ঘরের হাওয়া। যেন ইলা মুহূর্তের জন্য ভাবতেও পারে— এখন তো ও এখানে বসেই কাজটা করতে পারে। আবার, সেই মুহূর্তের পরার্ধেই ভেবে ফেলতে পারে— এ ঘরে আলো জ্বেলে কাজ করলে ভবা বিছানায় কিছুতেই ঘুমুবে না। তার চেয়ে কাজ করে নেমে আসুক। এই সব ভাবনার টুকরোগুলো উচ্চারিত হয় না। শিতি বেরিয়ে যায়। ইলা দরজার ছিটকিনি দেয়।

ভবা রাতে শোয়ার জামা পরে মা-র হাত ধরে শোয়ার ঘরের দিকে যেতে-যেতে বলে ওঠে, 'এটা একটা মজা হল। বাবা ওপরে ছাদে আর আমরা নীচে।' ভবা খিলখিলিয়ে ওঠায় বোঝা যায়, এটা তার কাছে মজাই ঠেকেছে, মাকে খুশি করার জন্য বলে নি। ইলা তার কাঁধে হাত দিয়ে ঘরে ঢোকে ওকে ঘুম পাড়াতে। বিছানায় ভবাকে জড়িয়ে ধরে বুকের ভেতরে টেনে নেয়। ভবাও যেন ইলার বুকের একেবারে ভেতরে ঢুকে পড়ে। তার মাথাটা ইলার থুতনির নীচে। ভবার এত ঝাঁকড়া চুল যে সে টেরও পায় না— ইলার চোখ বেয়ে গোনাগুনতি দু-ফোঁটা জল সেই ঝাঁকড়া চুলে পড়ল। ইলা নাক টানল না। শুধু তার চব্বিশ ঘণ্টার ভয়কাতুরে হাত দিয়ে ভবাকে আরও জড়িয়ে ধরল।

যখন ইলা হঠাৎ চমকে ঘুম ভেঙে ভয় পেয়ে জেগে ওঠে, কোনো এক বাস্তবতায় স্বপ্ন ভেঙে, বা, কোনো একটা নিশীথ প্রাকৃতিক ধ্বনিতে, যা তার গভীর ঘুমের বিস্মরণকে সূচিভেদ্য নিশ্চয়তায় বিঁধতে পারে, তার এই ঘুম কি একেবারেই একার ছিল, তার পাশে কি ভবা নেই, তার কি কোনো চরম সর্বনাশ ঘটে গেছে— তখন তার মনে পড়ে: শিতি যেন কোথায় গিয়েছিল, শিতি তো ফেরে নি, শিতিই কি তাহলে বেল টিপেছে, টিপে দাঁড়িয়ে আছে, আলুথালু ইলা মশারি ভেদ করে বেরিয়ে যায় আর তার খসে-পড়া আঁচল তার পেছনে-পেছনে বয়ে যায় কোনো আগুনের আনুভূমিক শিখার মত, যা তাকে অবধারিত পোড়াবে পায়ের তলা থেকে, ইলা ছিটকিনি খুলে দেখে— বাইরে দাঁড়িয়ে শিতি, খালি গায়ে, কলারওয়ালা গেঞ্জি কাঁধে, দুই হাতে ধরা ল্যাপটপ— ঢাকনা-খোলা, শিতি তার দুই ঠোঁট বিস্ফারিত করে আছে এক অনুচ্চার হাহাকারে, সে হা-হার কোনো ধ্বনি হয় না, তার মুখ থেকে লালা গড়াচ্ছে, চোখ থেকে জলের ধারা— যেন আরণ্যক কোনো পর্বত গহ্বর থেকে, আর তার ভুরু উঠে গেছে কপালে, তার কপাল অজস্র আনুভূমিক রেখায় রেখায় উঠে গেছে তার মাথার খুলির ভেতরে, ঘরের ভেতরে এসে ছোট সেন্টার টেবিলটার ওপরে সে খোলা ল্যাপটপটা রাখে, ল্যাপটপের পর্দা জুড়ে তাদের ভবার ছবি, দুই ঠোঁট মুচড়ে একটা হাসি লুকোনো, যেমন ও লুকোয়— ইলা সেই ছবির দিকে তাকিয়ে নীরব আর্তিতে বিস্ফারিত চোখে নাক ও জলের পর্দা ভেদ করে দেখে সযত্ন-আহরিত ভবার বার্থ সার্টিফিকেটের নামটাই ইংরেজি ক্যাপিটাল হরফে খোদাই করা: আসিফা। শিতিকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে ইলা— তার দুই হাত শিতিকে বেষ্টন করতে পারে না, ঘরের দরজা খোলা, ইলার খসে-যাওয়া আঁচল যেন তার চুল ছুঁয়েছে কি ছোঁয় নি, আগুন হাওয়া টেনে আনে, আগুন বেরবার পথ পায় না, দু-জনের নীরব হা হায় আর কতটুকু হাওয়া— কিছু একটা আশ্রয়ের জন্য শিতি ইলাকে জড়িয়ে ধরে কাঁধে। ইলা নিশ্চিত বোধ করে তার গর্ভ আলোড়িত হচ্ছে। তার দ্বিতীয় গর্ভ তৈরি হচ্ছে। ইলার দ্বিতীয় গর্ভ। ❖❖

অলংকরণ: ইন্দ্রনীল ঘোষ